ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1546-1552
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.163

প্রকৃতির বর্ণনায় ভবভূতি

মনিকা রায়, *রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, সংস্কৃত বিভাগ, আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 26.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Sanskrit Dramatic Literature, Bhavabhuti was renowned Sanskrit scholar, poet and playwright of 8th century India. He is regarded as the second most revered figure after Kalidasa. Just as the drama 'Abhigyan Shakuntalam' written by Kalidasa is highly esteemed by the people of the world, similarly Bhavbhuti's 'Uttararamcharitam' is also the best of all plays in Sanskrit Literature. His other significant works are 'Malati Madhav' and 'Mahavircharita'. Nature is the source of all human's inspiration. In fact, Nature and human beings are harmonious and they are related to each other mutually. Since the beginning of the creation, there has been an inseparable and close relation between them. Different types of dreamy imaginations and thoughts are awakened in the inner world of man in the multiple beauty of nature. Many epic poets have composed various poems, epics and plays based on those imaginations and thoughts with their touch of reality. They have described the sweet and tender image of nature. But Bhavabhuti is not a traditional stereotype. His description of nature is slightly different level. He has depicted the natural scenes with the combination of the terrifying and horrible form of nature, though he had 0 great skill in painting natural landscapes in all his plays. In 'Uttararamcharita' and 'Malatimadhav' he was quintessential in describing the dreadful scene of the dark forest, the solitude of the rough mountain peaks, the description of the sometimes fierce animals, the softness of the humming of the waterfall and the frightful cremation scene and so on. In short, his natural beauty was manifold.

Key Words: Bhavabhuti, Uttararamcharit, Nature, Malatimadhav, Mahavircharit

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাস ও শূদ্রকের মতো ভবভূতি হলেন এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত দশ অঙ্কের 'মালতীমাধব' প্রকরণ এবং 'উত্তররামচরিত'ও 'মহাবীরচরিত' নামে সাত অঙ্কের দুটি রামকথা আশ্রিত নাটক রচনা করেন। ভবভূতি তাঁর নাটক তিনটির প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ে লিখেছেন- দাক্ষিনাত্যে পদ্মপুর নামে এক নগর ছিল সেখানে কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাধ্যায়ী কাশ্যপ গোত্র উদুম্বর নামক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নীলকন্ঠ ও মাতা জাতূকর্ণি। তিনটি গ্রন্থেই তিনি নিজেকে "শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ ভবভূতিনাম"। ভবভূতি তাঁর নিজের নাম বলেছেন 'শ্রীকণ্ঠ'। তিনি ঘননিধি নামক গুরুর শিষ্য ছিলেন। তিনি একাধারে বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য-যোগ দর্শনাদী এবং ছন্দঃ জ্যোতিষাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

'মহাবীরচরিত', 'মালতীমাধব' ও 'উত্তররামচারিত' এই তিনটি নাটক লেখায় ভবভূতি যথাক্রমে বীর,শৃঙ্গার ও করুণ রসকে মূখ্যরস হিসাবে উপস্থাপনা করেছেন। 'মহাবীরচরিত' কবির প্রথম রচনা। 'মালতীমাধব' কল্পিত

কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অপর দুখানি নাটক ‘উত্তররামচরিত’ও ‘মহাবীরচরিত’ রামচরিত অবলম্বনে রচিত। ‘মালতীমাধব’ দশাঙ্ক প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। বিদর্ভের রাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব ও উজ্জয়িনীর মন্ত্রী ভুরিবসুর কন্যা মালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। ‘মহাবীরচরিত’ ভবভূতির দ্বিতীয় নাট্যকৃতি। সাতটি অংকে রচিত সীতার বিবাহ থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং অভিষেক পযর্ন্ত ঘটনার চিত্ররূপ একে একে তুলে ধরেছেন। ‘মহাবীরচরিত’ বীররস প্রধান হলেও অন্যান্য অঙ্গরসের উপস্থাপনও লক্ষ্য করা যায়।

নাট্যকার ভবভূতির আবির্ভূতকাল নিয়ে অনেক বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। রাজশেখর ‘বালরামায়নে’ ভবভূতিকে বাল্মীকির অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। বামনের রচিত ‘কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি’তে ভবভূতির রচনার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। বামনের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতক। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের কবি বাণভট্ট, ভাস, কালিদাস, বৃহৎ কথা, সেতুবন্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাই ভবভূতিকে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের পরে ও অষ্টমশতকের মধ্যে অর্থাৎ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভবভূতির আবির্ভাবকাল ধরা হয়। কাশ্মীরীয় ঐতিহাসিক কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থে ভবভূতির কাল সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে- প্রাকৃত ভাষায় রচিত ‘গৌরবহ’কাব্যের গ্রন্থকার বাকপতিরাজের সঙ্গে ভবভূতিও ছিলেন কান্য- কুব্জাধিপতি যশোবর্মনের সভাকবি।

‘উত্তররামচরিত’ ভবভূতির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। রামায়ণের উত্তর কান্ডের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি সাতটি অংকে বিভক্ত। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণকে আশ্রয় করে পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতে অনেক রামায়ণ রচনা হয়েছে। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভবভূতির ‘মহাবীরচরিত’ ও ‘উত্তররামচরিত’ নামে দুটি নাটক রচনা করেন। উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের পূর্ব ও উত্তর জীবনচরিত অবলম্বনে রচনা করেছেন। নাট্যকার ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’ নাটকটি কালপ্রিয় নাথের উৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ করা হয়। ‘উত্তররামচরিত’ নাটকের প্রথম অঙ্কের নাম চিত্রদর্শন। দ্বিতীয় অঙ্কের নাম পঞ্চবটী। তৃতীয় অঙ্কের নাম ছায়া। চতুর্থ অঙ্কের নাম কৌশল্যজনক যোগ। পঞ্চম অঙ্কের নাম কুমারবিক্রম। ষষ্ঠ অঙ্কের নাম কুমারপ্রত্যাভিজ্ঞান ও সপ্তম অঙ্কের নাম সম্মেলন।

‘উত্তররামচরিত’ সাতটি অঙ্কের মধ্যে প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শনকালে বণভূমিতে যাওয়ার জন্য সীতার ব্যাকুলতা। সীতার মনের বাসনা পূরণের জন্য রামের আদেশে রথ প্রস্তুত হল।

ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’এ প্রকৃতির বর্ণনায় গুরুগম্ভীর, ভয়ানক রুদ্র ও বীভৎস দৃশ্য বর্ণনার প্রতি ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। কখনো গহণ অরণ্যের ভয়ঙ্কর রূপ তো কখনো রুক্ষ পর্বত শৃঙ্গের নিবিড়মালা, সমুন্নত পর্বতের সানুদেশে যে লতাগুল্মের প্রাকৃতিক চিত্র প্রদর্শন হয় তা ভবভূতি খুব সুন্দর তুলে ধরেছেন। তেমনিকরে জলপ্রপাতের প্রচন্ড জল পতনের শব্দে মুখর গিরি গুহার চিত্র বর্ণনা, হিংস্র জীবজন্তুর গতিপ্রকৃতির সুন্দর চিত্র তাঁর লেখনীর দ্বারা পাঠকবর্গকে এক অন্য মাত্রার প্রকৃতির চিত্র দর্শন করান। ‘উত্তররামচরিত’ নাটকে ‘চিত্রদর্শন’ নামক প্রথম অংকে রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ দ্বারা চিত্র প্রদর্শিত হলে সেখানে বিগত দিনের বনবাসের অবস্থানে গিরিনিঝরিণীতীরে সেই তপোবনের চিত্র পরিবেশিত হয়। সেই তপোবনের নীবার ধান চাষ করে ঋষিরা কুটির নির্মাণ করেন। ওজোগুণসমন্বিত প্রস্রবণ গিরির দৃশ্যে প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায়। জনস্থানের মধ্যবর্তী সেই প্রস্রবণগিরি, সেখানেই সর্বদা বর্ষণকারী মেঘমালায় স্নিগ্ধ নীলিমায় শোভিত হওয়ার দরুন অন্ধকার আরও বেশী নিবিড়। এই গুহাগুলির চারদিকেই গোদাবরী নদীর জলে বেষ্টিত ও জল কলরবে মুখরিত; সেই গোদাবরীও বনের সংস্পর্শে নীল, স্নিগ্ধ এবং ঘন নিবদ্ধ এবং তরুর দ্বারা গভীরভাবে বেষ্টনে বেষ্টিত।

‘উত্তররামচরিত’ এ দ্বিতীয় অঙ্কে নায়ক রামচন্দ্রের বিরহের মধ্যে দিয়ে দন্ডকারণ্যের যে প্রকৃতির মধ্যে জানকীর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শনের মাধ্যমে কবি একদিকে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে দন্ডকারণ্যে দিব্যদেহকারী শম্বূকের মুখে প্রকৃতির রুদ্র, ভয়ানক ও গম্ভীর রূপটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির এই গুরুগম্ভীর রূপটি বনদেবী বাসন্তী ও আত্রেয়ীর কথোপকথনে জানা যায় যে, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য স্বর্ণসীতাকে তৈরী করে যজ্ঞ করছেন ।শম্বুক বধের জন্য রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করার পর পূর্বের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শন কর সীতার জন্য বিলাপ করতে লাগলেন এবং ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। এই দৃশ্যে ভাগীরথীর বরে সীতা অদৃশ্যরূপিণী হয়ে রামচন্দ্রের সীতা বিরহের যে কষ্ট সেটি উপলব্ধি করেছেন। পঞ্চবটী বনের বর্ণনায় রামচন্দ্র বলেছেন-

“পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং

বিপর্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহো দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি।।"[১]

আগে যেখানে ছিল নদীদের স্রোতের ধারা,সেখানে বর্তমানে পরিণত হয়েছে বালুকাময়।বনভূমি আগে যে গভীর ছিল তা এখন হয়েছে পরিবর্তন। তাই বর্তমান বনভূমিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্য বন দেখছি। শুধুমাত্র পর্বতগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এই সেই আগের বনভূমি। পঞ্চবটীর ভালোবাসে রামচন্দ্র এতটাই বিভোর যে তাঁর যাওয়ার সময় আসলেও বলছে যে পঞ্চবটিতে এত সুমধুর স্মৃতি রয়েছে যে মনে হয় পঞ্চবটীর স্নেহ জোর করে আটকে রেখেছে যেতে দিচ্ছে না।

"একঃ সংপ্রতি নাশিতপ্রিয়তমস্তামদ্য রামঃ কথং
পাপঃ পঞ্চবটীং বিলোকয়তু বা গচ্ছত্বসংভাব্য বা।"[২]

পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে কাটানোর সেই সুখের দিনগুলির কথা স্মরণ করে শোকের সঙ্গে বলেছেন যে, পঞ্চবটী থেকে যাবার পর সীতার সঙ্গে সেই সুন্দর দিনগুলির কথা আলোচনা করতাম। কিন্তু বর্তমানে সীতাকে পরিত্যাগ করে পাপাত্মা আমি রাম আজ একাকী এই পঞ্চবটী বনে এসে পঞ্চবটীকে ভালবাসা ও আদর না করেই বা কেমন করে যাবো?

প্রকৃতির বর্ণনায় ভবভূতি উত্তর রামচরিতের পঞ্চবটী বনের যে বর্ণনা করেছেন তা হল, গ্রীষ্মের প্রখর তেজে তীরস্থ বৃক্ষগুলিতে যে পাখিরা বাস করছে তাদের কষ্টকর অবস্থা, অন্যদিকে হস্তীদের গণ্ড ঘর্ষণের জন্য গাছেগায়ে যে আঘাত করছে তার ফলে গ্রীষ্মের তাপে শিথিল বৃন্ত থেকে ফুলগুলি ঝরে পড়ছে। তা দেখে মনে হচ্ছে সেই ফুল দিয়ে গাছগুলি যেন গোদাবরীর অর্চনা করছে। গাছের মধ্যে অবস্থিত পাখিরা খাদ্যের জন্য চঞ্চুর ঠোকরের দ্বারা কীটগুলি বের করে নিচ্ছে। সেই গাছের শাখায় ক্লান্ত কপোত ও বন্য মুরগীর কূজন শোনা যাচ্ছে।

"কণ্ডূলদ্বিপদগণ্ডপিণ্ডকষণোৎকম্পেন সংপাতিভি
ঘর্মস্রংসিতবন্ধনৈঃ স্বকুসুমৈরচন্তি গোদাবরীম্।"[৩]

যখন রামচন্দ্র শম্বুক বধের জন্য দন্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন তখন সীতা বিরহী রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে সহবাসের পূর্ব পরিচিত স্থানগুলি দর্শন করার পর দীর্ঘ ১২ বছর সীতা থেকে দূরে থাকায় তাঁর হৃদয় সীতা শোকে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিরহী রামচন্দ্রের মুখ থেকে কবি ভবভূতি প্রকৃতির সেই চিরাচরিত সৌন্দর্যয়ই সুললিত ভাষায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার ও বসন্ততিলক বৃত্তে তুলে ধরেছেন। যথা–

"এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরা-
স্তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলানি।"[৪]

এই সেই পর্বতমালা; যেখানে ময়ূরের কেকাধ্বনি সেই বনস্থলি যেখানে মত্ত হরিণগুলি অবাধে বিচরণ করে , মনোহর অশোকতরু, সুন্দর বেতসলতায় মণ্ডিত নদীর তট এবং ঘনসন্নিবিষ্ট কদম্ব বৃক্ষে শোভিত। আবার অপরদিকে দন্ডকারণ্যের রুক্ষ প্রকৃতির ব্যাখ্যায় রামচন্দ্র বলেছেন –

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝংকৃতৈর্নির্ঝরণাম।"[৫]

দন্ডকারণ্যের রামচন্দ্র শম্বুককে বলছেন যে, ভূভাগ যার তীর্থ, তপোবন, পর্বত, নদী গহ্বর ও অরণ্যময় স্থানগুলি আমার পূর্বপরিচিত। কোন কোন স্থানগুলি নবপল্লবের স্পর্শে মসৃণ ও শ্যাম বর্ণের আর কোথাও বা ভীষণ রুক্ষ। আর সবদিক নির্ঝরসমূহের জলের ঝং ঝং শব্দে মুখরিত হচ্ছে। সীতা শোকে উদ্বেল রামচন্দ্রকে শম্বুক দন্ডকারণ্যের বর্ণনায় জানে যে যখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এই অরণ্যে বাস করেছিল তখনকার প্রকৃতি ছিল মনোরম। কিন্তু তাদের অবর্তমানে পর্বতের গুহাগুলিতে বন্য, ভয়ঙ্কর প্রাণীর দ্বারা বিপদসঙ্কুল যা সাধারণ লোকের ত্রাসের সৃষ্টি করে। বনের প্রান্তভুমি নিশ্চল ও নীরব; কোথাও আবার হিংস্রজন্তুদের বিকট আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আবার বিস্তীর্ণ ফণা বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপের নিঃশ্বাসে আগুন জ্বলে ওঠে। কোথাও যদি গহ্বরের মধ্যে একটু জল দেখা যায় তো সেখানে অজগরেরা ডেরা বেঁধেছে।

"নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ

স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর ভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়হ।”[৬]

শম্বুকের দন্ডকারণ্যের প্রকৃতি বর্ণনায় দেখা যায় ক্রৌঞ্চারত পর্বত, সেই পর্বতে বিশাল বাঁশবন থাকার জন্য বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় শন্ শন্ শব্দ হয় তার সাথে বিচিত্র আওয়াজকারী কাকেরা নীরব থাকে। সেই বাঁশ ঝাড়ে অসংখ্য পেঁচকের শব্দ প্রতিধ্বনিত। এই ক্রৌঞ্চাবত পর্বতের সাপেরা ময়ুরের ভয়ে সবসময় ভীত হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে চন্দন বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় নেয়।

“কূজৎকুঞ্জকুটীর কৌশিকঘটাঘূৎকারবৎকীচক
স্তম্বাড়ম্বরমূক মৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরিঃ।”[৭]

ভবভূতির লেখায় সমাসে, সন্ধিতে ও শব্দচয়নে এইসব শ্লোকের অর্থ দুরহ হলেও যখন এর অর্থ অনুধাবন করা হয়, তখন মনে হয় প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর চিত্র কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। প্রকৃতির বর্ণনায় উত্তররামচরিতের পঞ্চম অঙ্কে লব ও লক্ষ্মণ পুত্র চন্দ্রকেতুর সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে নিয়ে যে তুমুল যুদ্ধ দেখা যায়। সেই ভীষণ সংগ্রামের বর্ণনায় ভবভূতি প্রকৃতির বর্ণনায় শব্দের যাদুমন্ত্রে অসির যে প্রচন্ড আস্ফালন তুলে ধরেছেন তা অনবদ্য। লব ও চন্দ্রকেতুর দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে অস্ত্রের শিখা এক হরিদ্রাভ উজ্জ্বলতায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছে দেখে মনে হয় পিতলের দীপ্তি। অস্ত্রগুলি বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ার মতো যার গুহাগুলি উপর বিষন্ন মেঘ খণ্ড এবং বিদ্যুতের প্রদীপ্ত বিচ্ছুরণে পিঙ্গলবর্ণের আকাশ। এইসব প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয় অপূর্ব দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। ভাষার অসাধারণ নিপুনতার পাঠকবর্গ যেন প্রকৃত যুদ্ধ দর্শন করছে।

“পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃ শ্যামৈর্নভো ঝিরম্বকই-
রত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিল জ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।”[৮]

ভবভূতি যে ‘উত্তররামচরিত’ এ প্রকৃতি বর্ণনায় নিপুণ ছিলেন তা নয়, ‘মালতীমাধব’ এবং ‘মহাবীরচরিত’ এই দুই নাটকে সর্বত্র বহুবিচিত্র প্রকৃতি চেতনার দিকগুলি আলোচনা করেছেন।‘মালতীমাধব’ কাহিনী ভবভূতির স্বকল্পিত হলেও এখানে গুণাঢ্যের ‘বৃহৎকথা’ র কাহিনীর মিল পাওয়া যায়। এখানে পদ্মাবতী নগরের রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর একমাত্র কন্যা মালতী আর বিদর্ভ রাজের অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধব এদের কাহিনী নিয়ে রচিত এই সামাজিক রূপক ‘মালতীমাধব’। ‘মালতীমাধব’এর পঞ্চম অঙ্কে ভবভূতির শ্মশান বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির গা ছমছমের ভিন্ন মাত্রার বর্ণনা। ভয়ানক ও বীভৎস দৃশ্য বর্ণনা করেছেন নায়ক মাধব।

“বাত্যাসংবেগবিষ্বগ্বিততবলয়িতস্ফীতধূম্যাপ্রকাশং
প্রারম্ভেহপি ত্রিযামা তরুণয়তি নিজং নীলিমানং বনেষু।”[৯]

অনেক পুরানো নিম তেলের মধ্যে যখন রসুন ভাজা হয় তখন যে গন্ধ বেরোয় ঠিক শ্মশানের চিতাগুলির ধূম থেকে সেই গন্ধ বেরোচ্ছে। আগুনে মৃতদেহ পোড়ানো গন্ধে চারদিক ভরপুর। শ্মশানে অবস্থিত পিশাচের যে ভয়ঙ্কর মূর্তি, তাদের আগুন ঝরা মুখগহ্বর, বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো কেশ, নখ, নয়ন ও ভ্রূ। খেঁজুর গাছের মতো লম্বা তাদের জঙ্ঘা, কালো চামড়ার নিচে ঢাকা পড়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া শিরাগ্রন্থিতে ভরা জীর্ণ কঙ্কালের পাঁজরের হাড়গুলি। মুখ থেকে আধচেবানো নরমাংস খসে পড়ায় তা দেখে শৃগালের হুক্কাহুয়া উল্লাস। পিশাচবধূদের সন্ধ্যেবেলার আমোদে তারা পরিধান করছে মৃতা রমণীদের রক্ত পদ্মের মতো হাতগুলি কর্ণভূষণ, হৃদপিণ্ডের পুণ্ডরীকমালা, জমে ওঠা রক্তের কুঙ্কুমে সেজেছে এক বীভৎস সাজে। ভবভূতির ‘মালতীমাধব’ এর পঞ্চম অঙ্কে শ্মশান বর্ণনায় যে এক বীভৎস ও নারকীয় দৃশ্য যেমনভাবে বর্ণনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায় অবাধ অধিকার থাকার জন্য হয়তো সেটি করতে পেরেছেন। মালতীমাধবের নবম অঙ্কে মালতীকে হারিয়ে মাধবের যে প্রিয় বিরহের প্রেম উন্মত্ত ও আচরণে প্রকৃতির এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে-

“এতস্মিন্ মদকলমল্লিকাক্ষপক্ষ-
ব্যাধূতস্ফরদরুদন্ডপুণ্ডরীকা।
বাষ্পাম্ভঃপরিপতনোদগমান্তরালে
দৃশ্যন্তামবিরহিতশ্রিয়ো বিভাগঃ।।” [১০]

‘মালতীমাধব’ এর সপ্তম অঙ্ক ‘নন্দন বিপ্রলম্ভ’ নামক অঙ্কে মকরন্দের মুখে রাজপথের বর্ণনায় এক অপূর্ব প্রকৃতির ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রাসাদগুলির চিলেকোঠার যে উঁচু জানালাগুলির প্রবেশ পথে যে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তার

সুরভিতে পাওয়া যাচ্ছে পরিপক্ক সুরা গন্ধের আমেজ। সে বায়ুতে ফুলমলার সৌরভে পূর্ণ আর জমে ওঠা কপূরের গন্ধে ভরপুর। সেই বায়ু জানাচ্ছে যে রাজপ্রাসাদের নববিবাহিত যুবকেরা তাদের নব বধূর সান্নিধ্য উপভোগ করেছে।

"প্রাসাদানামুপরি বলভীতুঙ্গবাতায়নেষু
প্রাপ্তামোদঃ পরিণতসুরাগন্ধসংস্কারগর্ভঃ।
মাল্যামোদী মুহুরূপচিতস্ফীতকপূরবাসো
বাতো যূনামভিমতবধূসন্নিধানং ব্যনক্তি।।"[১১]

'অন্বেষণ' নামক মালতীমাধবের নবম অঙ্কে সৌদামিনীর প্রবেশে লক্ষ্য করা যায় অপরূপ প্রকৃতির বর্ণনা। মালতী বিরহে পরিচিত স্থানগুলি দর্শন যেন মাধববের কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে-

"সৈষা বিভাতি লবণা বলিতোর্মিপক্তি
রভ্রাগমে জনপদপ্রমদায় যস্যাঃ।
গোগর্ভিণীপ্রিয়নবোলপমালভারি
সেব্যোপকণ্ঠ বিপিনাবলয়ো বিভান্তি।।"[১২]

স্বচ্ছতোয়া, বিশালসিন্ধু ও পর নদী উদ্বেল হয়ে এই পদ্মাবতীকে ঘিরে আছে। তেমনি মনোহর তরঙ্গমালা শোভিত দেখা যাচ্ছে লবণা নদী। বর্ষাকালে এর তীরবর্তী স্বর্ণভূমিতে গর্ভবতী গরুগুলি তৃণভূমিতে নতুন সবুজ ঘাস খাচ্ছে। নতুন সবুজভূমি থাকার জন্য জনপদ বাসীদের এক বিশেষ আনন্দ দান করে। ভগবতী সিন্ধুর তীরে আছড়ে পর স্রোতধারা ভূতলকে বিদীর্ণ করছে। যার তুমুল গর্জন জলে ভরা গম্ভীর নদী, নব মেঘের গর্জনের মতো প্রচন্ড ও প্রান্তে অবস্থিত পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গণেশের কণ্ঠ গর্জনের মতো শোভা পাচ্ছে। আর সেখানে অসংখ্য চন্দন, অশ্বকর্ণ, কেসর ও পাটলা গাছে নিবিড় ও পাকা বেলের গন্ধে সমস্ত পার্বত্য বনপ্রদেশ সুরভিত হয়। এদের দেখে মনে পড়ে যায় দক্ষিণ অরণ্যের পর্বত গুলির কথা, যেখানে মেখলা ভূমিতে নতুন কদম্ব আর জাম গাছ থাকার জন্য অন্ধকার হয় কুঞ্জগুলি ও গুহাগুলিতে গভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। সে আরও দেখছে যে পর্বতের গহ্বরে অবস্থিত তরুণ ভাল্লুদের থ্যুৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূরে সেই শব্দ ছড়িয়ে যায়। আর হস্তীদের দ্বারা দলিত ও বিদীর্ণ শল্লকীর গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত রসের শীতল, কটু ও কষায় গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' এর পঞ্চম অঙ্কে দেখতে পাওয়া যায় যে সীতার অপহরণের পরবর্তী সময়ে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের জন্য লক্ষ্মণ নিয়ে মলয় পর্বতে যান। সেখানকার প্রকৃতির যে নিবিড় বর্ণনা করেছেন তা হল-

"স্থিতমুপনতজৃম্ভারম্ভবিম্বৈঃ কদম্বৈঃ
কৃতমতিকলকণ্ঠৈস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠৈঃ ।
অপি চ বিঘটমানপ্রৌঢ়তাপিচ্ছনীলঃ
শ্রয়তি শিখরমদ্রের্নূতনস্তোয়বাহঃ।।"[১৩]

সদ্য প্রস্ফুটিত লক্ষণ দেখা দিয়েছে কদম্বকুসুমগুলির। আকাশে মেঘের দর্শনে তান্ডব নৃত্য করছে অতিকলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের দল। আবার দেখা যাচ্ছে পর্বতের শিখরে আশ্রয় করে আছে নীল নব মেঘ, যাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রস্ফুটিত প্রৌঢ় তমাল পুষ্পের মতো। অপরদিকে বালির বর্ণনায় শ্রমণা ব্যাখ্যায় প্রকৃতির শোভা প্রকাশ পায় ইন্দ্রপুত্র বালি তার পিঙ্গল অঙ্গে স্বর্ণ কমলের মালা ধারণ করেছে। তা দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা রাগে রঞ্জিত বিদ্যুতপূর্ণ একখন্ড মেঘ।

'মহাবীরচারিতম' এর সপ্তম অঙ্কে বিভীষণ রামচন্দ্রের সাথে আলোচনারত অবস্থায় পৃথিবীর বর্ণনায় বলেছেন যে, এই সেই হিমালয়ের পাদদেশ কপূর খন্ডের মতো উজ্বল। মন্দাকিনীর জলে ধৌত এর শিলাখন্ড, পরনে রয়েছে জীর্ণ ভূর্জবল্কল। এখানে তত্ত্বদর্শনে মোহের অন্ধকার দূর করেছিলেন অধ্যাত্মবিদ্যরসিক ব্রহ্মবিদেরা। এখনও তাদের জাগ্রত রয়েছে স্বভাবমধুর সৌম্য তেজ।

"এতে তে সুরসিন্ধুধৌতদৃষদঃ কপূরখন্ডোজ্জ্বলাঃ
পাদা জর্জরভূর্জবল্কলভৃতো গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
তত্ত্বালোকনিরস্তমোহতমসামধ্যাত্মবিদ্যাজুষাং

যত্র ব্রহ্মবিদাং নিসর্গমধুরং জগর্তি সৌম্যং মহঃ।।”[১৪]

ভবভূতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় জগত ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কবির নিজস্ব অনুপ্রেরণায় প্রকৃতির বিচিত্ররূপ, রস, গন্ধ আস্বাদন করেছেন। ভবভূতির প্রকৃতির বর্ণনায় কখনো প্রকৃতির সঙ্গে মানবচরিত্র তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় কত জানা অজানা বৃক্ষ, পশু, পাখির বর্ণনা করছেন। যেমন ময়ুর-ময়ূরীর কেকাধ্বনি, নানারঙের পাখির বাসায় আবৃত বনরাজি, মল্লিকাক্ষ, ককুভ ও কোয়েষ্টিক পাখির সাথে আমারা পরিচয় পাই। যা দেখে মনে হয় ভবভূতি ছিলেন প্রকৃতির স্বেচ্ছাবিহারী কবি। ভবভুতির ‘উত্তররামচরিত’র প্রকৃতির সম্পর্কে রবীন্দ্র নাথ প্রাচীন সাহিত্যে বলেছেন- “উত্তররামচরিতে ও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁরা পরিজনবর্গ।” সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস যেমন প্রকৃতির বর্ণনায় বৃহৎতর মানব মনের প্রমাণ দিয়েছেন অর্থাৎ প্রকৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু ভবভূতির প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার সত্বেও তিনি অতীন্দ্রিয় করে তুলেননি। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে ভবভূতি প্রকৃতির কবি রূপে পরিধি বহুল অসীম। প্রকৃতির বর্ণনায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ হলেও ভবভূতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতির ভয়ানক ও বীভৎস রসের বর্ণনা যা অন্য কোন নাট্যকারের নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্যামাপদ। উত্তররামচরিতম। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ: ১২৯।
২. তদেব, পৃ: ১২৯।
৩. তদেব, পৃ: ১০৩।
৪. তদেব, পৃ: ১২৩।
৫. তদেব, পৃ: ১০৯।
৬. তদেব, পৃ: ১১৫।
৭. তদেব, পৃ: ১২৯।
৮. তদেব, পৃ: ২৯৯।
৯. চাকী, জ্যোতিভূষণ। ভট্টাচার্য, তারাপদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবিশঙ্কর। ধর্মপাল, শ্রীমতী গৌরী। সম্পাদনা, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১৭ , নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭০০০০৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, পৃ: ৩৮৩।
১০. তদেব, পৃ: ৪১৩।
১১. তদেব, পৃ: ৪০৫।
১২. তদেব, পৃ: ৪১২।
১৩. চাকী, জ্যোতিভূষণ। ভট্টাচার্য, তারাপদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবিশঙ্কর। ধর্মপাল, শ্রীমতী গৌরী। সম্পাদনা, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১৭, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭০০০০৯, আগস্ট, ১৯৮২, পৃ: ১৭৫।
১৪. তদেব, পৃ: ১৯৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। পচিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭০০০৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০১৮
২. দাস,করুণাসিন্ধু। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,কলকাতা-৭০০০২০, দ্বিতীয়মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৬
৩. ভৌমিক, জাহ্নবীচরণ। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল,২০১০
৪. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। গিরিপ্রিন্ট সার্ভিস, কলকাতা -৭০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০১২

৫. দাস, ড. দেবকুমার। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। সদেশ, কলকাতা -৭০০০০৬, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১৬

ওয়েবসাইট:

Manna, kumar, Subrata, Mukhopadhyay, Dr. Anjalika, The relationship between nature and man in Bhavabhuti's play, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org